Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

"যশোরের খেজুরের গুড়"

GI Journal No. 27

Published on :

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জিআই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদণ্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে :

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোন ঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইল ঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৪৫
আবেদনের তারিখ : ২৩-০৫-২০২৩

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "যশোরের খেজুরের গুড়" যা শ্রেণি ৩০ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "যশোরের খেজুরের গুড়"

শ্রেণি ঃ ৩০

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চৌগাছা, যশোর।

খ) ঠিকানা ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, চৌগাছা, যশোর।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ যশোরের খেজুরের গুড় এক প্রকার মিষ্টি।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

১। খেজুরের রস থেকে তৈরি হয় গুড়।

২। যশোরের খেজুরের গুড় দুই প্রকার। তরল এবং শক্ত।

৩। শক্ত গুড় 'পাটালি, ঝোলা গুড়, দানাগুড়, চিটাগুড়' ইত্যাদি নামে পরিচিত।

৪। কেবল শীতকালে পাওয়া যায় যশোরের খেজুরের রস ও গুড়।

৫। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় যশোরের গুড় (শক্ত) ১ বছর পর্যন্ত ভালো থাকে।

৬। এই গুড় নির্দিষ্ট রঙের না হয়ে বাদামি, লালচে বাদামি ও জাম রঙেরও হয়।

৭। যশোরের খেজুরের গুড় এক প্রকার মিষ্টি তাই এটির স্বাদও মিষ্টি।

৮। এতে রয়েছে এক প্রকার সুমিষ্ট ঘ্রাণ।

৯। খেজুরের গুড় সরাসরি খাওয়া যায় এবং বিভিন্ন খাদ্যের সাথে মিশিয়েও খাওয়া যায়।

১০। শীতকালীন পিঠা, পায়েস, মোয়া, সন্দেশসহ বিভিন্ন খাদ্য তৈরিতে যশোরের গুড় ব্যবহার হয়।

১১। খেজুরের গুড়ে রয়েছে স্বাস্থ্য উপকারিতা।

১২। কেজি হিসেবে বিক্রি হয় যশোরের খেজুর গুড়।

১৩। খেজুরের গুড় যশোরের অর্থকরী ফসল।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

'গুড়' তৈরি করা হয় খেজুর গাছের রস থেকে। খেজুর গাছের জন্ম, বেড়ে উঠা এবং রস দেওয়ার জন্য যশোরের মাটি ও জলবায়ু বিশেষ উপযোগী। এ কারণে যশোরে খেজুর গাছ খুব ভালো জন্মায় এবং রস দেয় বেশি। এ ধারা চলে আসছে প্রাচীনকাল থেকে। খেজুরের রস একটি মৌসুমি ফসল। এটি খুবই সুস্বাদু। শীত মৌসুমে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সংগ্রহ করা হয় খেজুরের রস। কাঁচা রস ৪-৫ ঘণ্টা ধরে আগুনে জ্বাল দিলে তা ঘন হয় এবং গুড়ে পরিণত হয়। ঘন তরলকে বলা হয় গুড় আর শক্ত অবস্থায় ধরন অনুযায়ী খেজুরের গুড়ের নামকরণ হয় ঝোলা গুড়, দানাগুড়, পাটালি, চিটাগুড় ইত্যাদি নামে। যশোরের খেজুরের গুড় সরাসরি খাওয়া যায় এবং পিঠা, পায়েস, মোয়া, সন্দেশসহ নানা রকম খাবার তৈরি করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকে অবিভক্ত ভারতের প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, "যশোরের যশ, খেজুরের রস"। আবার খেজুর গাছ মধুবৃক্ষ বলেও পরিচিত। বাঙালি সংস্কৃতিতে এই রসের বেশ কদর। এটি শীতের দিনের অন্যতম আকর্ষণ। খেজুরের গুড়ের পিঠা, পায়েস, মোয়া, সন্দেশ খুবই সুস্বাদু। মুখে মুখে প্রচলিত আছে খেজুর গুড়ে স্বাস্থ্য উপকারিতা বিদ্যমান।

প্রাচীনকাল থেকে খেজুরের গুড় যশোরের অর্থকরী ফসল। অতীতে খেজুরের গুড় দিয়ে চিনি তৈরি করা হতো। পরে চিনি ও গুড় তৈরি শুরু হয়। এরপর শতাব্দীর বেশি সময় ধরে যশোরের খেজুরের রস থেকে কেবল গুড়ই বাজারজাত করা হয়। জেলার সব (৮টি) উপজেলাতেই খেজুরের রস ও গুড় উৎপাদন হয়। হাজার হাজার কৃষকের অন্যতম উপার্জন উৎস খেজুর গাছ। এছাড়াও গুড় তৈরি করা, বাজারজাত করাসহ বিভিন্ন ভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে।

খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহের পূর্বে অগ্রহায়ণের শেষ দিকে গাছের কান্ডের একেবারে উপরের অংশে পাতা সম্বলিত বাকলগুলি ধারালো দা দিয়ে চেঁছে পরিষ্কার করা হয়, যাকে গাছ তোলা বলে। সাত থেকে আট দিন পরে পুনরায় পরিষ্কার করা হয়। গাছ তোলার দুই সপ্তাহের মাথায় চাঁছা অংশ কিছুটা কেটে নলি (বাঁশের নল) ও খিল লাগিয়ে এবং সম্মুখভাগে হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিয়ে রস সংগ্রহ করা হয়।

রস সংগ্রহের সময়কালের উপর ভিত্তি করে খেজুরের রসকে জিড়ান, দোকাট এবং ঝরা এই তিনভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম রাতের রস গুণে ও মানে সর্বোৎকৃষ্ট এবং পরিমাণেও বেশি হয়। এই রসকে বলা জিড়ান। পরদিন বিকালে গাছের কাটা অংশটুকু দা এর সাহায্যে চেঁছে পরিষ্কার করা হয় এবং দ্বিতীয় রাতে নির্গত রসকে বলা হয় দোকাট। তৃতীয় রাতে প্রাপ্ত রসকে ঝরা বলা হয়। পরবর্তী তিনদিন গাছকে অবসর দেওয়া হয়। এরপর আবার নতুন করে চাঁছা ও রস সংগ্রহ করা হয়।

খেজুরের রস আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। যত শীত তত মিষ্টি ও সুস্বাদু হয় খেজুরের রস। মেঘলা গুমোট রাতে খেজুরের টকভাব আসে। নভেম্বরের প্রথম দিকে রস সংগ্রহ শুরু হয়। তবে ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রস পাওয়া যায়।

সাধারণ অবস্থায় খেজুরের রস দীর্ঘসময় ভালো থাকে না। একটি বড় পাত্র বা তাফালে গাছ থেকে নামিয়ে আনা খেজুরের রস ছেকে জ্বাল দেওয়া হয়। এক পর্যায়ে রস ঘন হয়ে ঝোলাগুড়ে পরিণত হয়। পাটালি গুড় তৈরি করার জন্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে ঘন করার পর তা ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়। যশোর অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়নে খেজুরের গুড়ের অনেক ভূমিকা রয়েছে।

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

প্রাচীনকাল হতে যশোরে উন্নতমানের খেজুরের রস ও গুড় পাওয়া যায়। অতীতে যশোরের খেজুর গুড়ের চিনিই ছিল প্রসিদ্ধ। যশোর জেলার সবগুলো উপজেলায় খেজুর গাছ রয়েছে। এ কারণে জেলা ব্র্যান্ডিং স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে, "নানা রঙের ফুলের মেলা/খেজুর গুড়ের যশোর জেলা"। ১৬ লাখ ৪১ হাজার ১৫৫ টি গাছ রয়েছে যশোর জেলায়। ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৯৫৫ টি গাছ থেকে ৫ কোটি ২৪ লাখ ৯৩ হাজার ২৫০ লিটার রস পাওয়া যায়। তা থেকে ৫২ লাখ ৪৯ হাজার ৩২৫ কেজি গুড় উৎপাদন হয়ে থাকে। যার আর্থিক মূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি। জেলার ৮ টি উপজেলায় ১৩ হাজার ১'শ ৭৩ জন গাছি রয়েছে।

জ) উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিলাদি) ঃ

যশোরের খেজুর গুড়ের ইতিহাস অনেক পুরনো হওয়ার কারণে অতীত ও বর্তমানে বিভিন্ন বই পত্রে গুরুত্বের সাথে বর্ণিত হয়েছে। সেখান থেকে কয়েকটি বইয়ের বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো---

১৯২২ সালে প্রকাশিত যশোহর-খুলনার ইতিহাস বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের ৪৮৯-৪৯৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা হয়েছে যশোরের খেজুর গুড় সম্পর্কে, "চিনিই যশোহরের প্রধান পণ্য। এখানে ইক্ষু চাষ বা ইক্ষুর চিনি অতি কমই হয়। চিনি বলিতে এ অঞ্চলে খেজুর চিনিই বুঝায়, কারণ উহাই সহজে ও সস্তায় উৎপন্ন হয়। ....অপর পক্ষে এদেশে খেজুর গাছ সহজে জন্মে, একটু উচ্চজমিতে বীজ ছড়াইয়া রাখিলেই গাছ হয়। ....৬/৭ বছর পরে গাছগুলি হইতে রস বাহির করা যায় এবং পরবর্তী অন্ততঃ ২৫/৩০ বৎসরকাল উহা একটি বাৎসরিক লাভের সম্পত্তি হইয়া থাকে। খেজুরগাছ যশোহর-খুলনার একটি প্রধান বিশেষত্ব; এখানকার লোকেই হই কাটিয়া রস বাহির করিতে এবং রস হইতে গুড় চিনি প্রস্তুত করিত জানে। অন্য জেলার লোক তাহা জানে না। এমন কি, অন্য জেলায় খেজুর গাছ থাকিলেও তাহার সদ্ব্যবহার হয় না। এরপর লেখক গুড়ের প্রণালী বর্ণনা করে লিখেন, "যাঁহারা খেজুর গাছ কাটিয়া রস বাহির করেন, তাঁহাদের নাম গাছি (বা শিউলি)। বর্ষান্তে গাছিরা খেজুর গাছ 'তোলে' অর্থাৎ উহা মাথার একদিকের পাতাগুলি গোড়া কাটিয়া তুলিয়া ফেলিয়া সেই অর্ধেকটা চাঁছিয়া পরিষ্কার করেন। কিছুদিন পরে ঐস্থান বেশ শুকাইয়া গেলে, পুনরায় 'চাঁছ দেন' অর্থাৎ চাঁছিয়া পরিষ্কার করেন এবং ভাঁড় টাঙ্গাইবার জন্য উপরের একটি পাতার গোড়ায় একগাছি করিয়া দড়ি ঝুলান এবং চাঁছ দেওয়া স্থানটিও নিম্নভাগে দুইদিকে দুইটি খাঁজ কাটিয়া তাহার সন্ধিস্থলের কিছু নিম্নে একটি বিঘত-প্রমাণ বাঁশের কঞ্চি 'নলী' বসান। তখন কর্তিত স্থানের রস খাঁজ বাহিয়া নলীর মুখ দিয়া ভাঁড়ের মধ্যে পড়িতে পারে। চাঁছের পর ভাঁড় পাতিলে রাত্রিতে সামান্য রস হয় বটে, কিন্তু উহা লবণাক্ত। উহাও জ্বালাইলে এক প্রকার গুড় হয় এবং তাহা পাতায় ঢালিয়া শুকাইয়া,

'পাটালি' প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু চাঁছের পাটালি লবণাক্ত বলিয়া সুস্বাদু নহে। গাছটি আরও একটু শুকাইলে, কয়েকদিন পরে যখন পরিষ্কৃত স্থানটির মধ্যস্থলে দুই পার্শ্বে অর্ধচন্দ্রাকারে কাটিয়া উহার রস নলীতে যাইবার পথ করিয়া দেওয়া হয়, তখনকার রসে এক প্রকার সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়, উহাকে 'নলিয়ান' গন্ধ বলে। সে রসের গুড় হইতে যে নলিয়ান গুড় বা পাটালি হয়, উহা বাঙ্গালীর বড় লোভনীয় খাদ্য। এই গুড় পৃথক করিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিলে কয়েক মাস তাহার গন্ধ থাকে এবং চিনির সঙ্গে উহার স্বল্প সহযোগে 'ভীমনাগের নূতন গুড়ের সন্দেশ' তৈয়ারী হয়। অতি অল্প কয়েকদিন নলিয়ান গন্ধ থাকে ; পরের বার যখন গাছগুলি কাটা হয়, তখন সেই পরবর্তী কাটকে 'পর-নলিয়ান' বলে। গাছিয়া তাঁহাদের গাছগুলি কয়েক 'পালায়' বিভক্ত করিয়া এক এক পালা একদিনে কাটেন। পর পর তিন দিনের বেশী এক সময়ে কোন গাছ রস প্রদান করেন না। পরবর্তী আর তিন দিন গাছকে বিশ্রাম বা 'জিরান' দিয়ে আবার যখন কাটা হইতে থাকে, তখন প্রথম দিনের কাটকে 'জিরানকাট' বলে, সেদিনের রস খুব পরিষ্কৃত ও সুস্বাদু হয়। পরদিনের কাটকে 'দোকাট' ও তৃতীয় দিনের কাটকে 'তেকাট' কহে। গাছগুলিকে রোগীর মতো সন্তর্পণে পালন করিতে হয়, বেশী গভীর করিয়া বারংবার কাটিলে শীঘ্রই উহাদের জীবনান্ত হয়। তৃতীয় দিনে প্রায়ই গাছটিকে না কাটিয়া কেবল মাত্র মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাত্রির জন্য ভাঁড় বাঁধা হয়, উহাকে 'ঝরা' বলে, এবং দিনের বেলায়। সংগৃহীত রসের নাম 'ওলা'। প্রথম দিন অপেক্ষা প্রতি রাত্রিতে ক্রমেই রস কম হয়....।" রস হইতে গুড় উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা করে লিখেন, "প্রত্যুষ হইতে গাছের রস পাড়িয়া রসের ভাঁড়গুলি বাঁকে করিয়া কারখানায় বা বাইনশালে লইয়া যান। যে উনুনে রস জ্বাল দিয়া গুড় হয়, তাহার নাম বা'ন বা বাইন। ঐ চুল্লীতে দুইটি হইতে ৮/১০ পর্যন্ত মুখ থাকে, তাহাতে নাদা বা 'জ্বালুয়া' নামক মাটিয়া কড়া চড়াইয়া দিয়া রস পূর্ণ করা হয় এবং ৪/৫ ঘণ্টা ধরিয়া যথেষ্ট জ্বালানি কাঠ বা শুষ্ক পত্রে সদ্ব্যবহার করিলে, রসের রঙ সরিষা ফুলের মত হইয়া পরে উহা হইতে হরিদ্রাভ লাল গুড় হয়। সময় মত জ্বালুয়াগুলি নামাইয়া কাঠি বা তাড়ুয়া দিয়া গুড়ের পার্শ্বে ঘসিয়া 'বীজ মারিতে' হয় ; যখন ঘন ঘর্ষণে গুড় হইতে শুষ্ক শ্বেতবর্ণ গুঁড়া ঝরিয়া পড়িতে থাকে, তখন গুড়ের দানা বাঁধাইবার জন্য ঐ গুঁড়া বীজ গুড়ের সঙ্গে মিশাইয়া তাহা হইতে পাটালি প্রস্তুত হয়, অথবা সে গুড় বড় কলসী, গাদন বা গাছানে কিম্বা ছোট ভাঁড় বা ঠিলায় ঢালিয়া রাখা হয়। এই সকল কলসী বা ভাঁড় হাট বাজারে বিক্রি হয়। লেখক আরও লিখেন, "গুড় কতক গৃহস্থের সংসার খরচে লাগে, কতক হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। পূর্ব্বে যাঁহারা গুড় হইতে চিনি বাতাসা প্রস্তুত করিতেন, তাঁহাদের নাম কুরি। সেই কুরি বা কারিগরেরা গুড় কিনিয়া লইয়া চিনি প্রস্তুত করেন, কোন কোন স্থানে গাছিরাও নিজ বাটীতে অল্প চিনি প্রস্তুত করিয়া হাটে বিক্রয় করেন। ৫০ বৎসর পূর্বে গুড়ের কাঁচি (৬০ তোলায় সের) মণের দর এক হইতে দুই টাকার মধ্যে ছিল, এখন উহা দ্বিগুণেরও অধিক অর্থাৎ ৪ টাকা বা সাড়ে ৪ টাকা পর্যন্ত উঠিয়াছে।" ....সংক্ষেপে বলা যায় খুলনায় চিনির কারবার নাই, যাহা আছে যশোহরেই। ....এখন যশোহরের গুড়ই অন্য জেলায় নীত হইয়া চিনি কারখানায় ব্যবহৃত হইতেছে। চিনির কারখানা যাহাই হউক, শীতকালে কতকগুলি গুড়ের হাট দেখিবার উপযুক্ত। ইহার মধ্যে রুপদিয়ার নিকটবর্ত্তী ছাতিয়ান-তলার হাট সর্বোৎকৃষ্ট। শীতকালে প্রতি বৃহস্পতিবারে হাটের দিন তথা সহস্রাধিক গরুর গাড়ীতে গুড় আসে এবং উহা কিনিয়া লইয়া যাইবার জন্য দুই তিন শত ব্যাপারী নৌকা মরা ভৈরবের শৈবালময় বক্ষে ভাসমান থাকে। ....কৌটচাঁদপুর এখনও যশোহরের মুখ রাখিয়াছে। এখানকার কারবার আবার সবেগে চলিতেছে। ১৯৮৪ অব্দে এখানে ৬৩ কারখানায় মোট ৯,৩৮,৮৫০ টাকা খাটাইয়া ১,৫৬,৪৭৫ মন চিনি পাওয়া যায়। ....প্রতি শীতকালে প্রত্যেক পেতেয় ৪ মণ গুড়ের কাজ হয়। ....গুড়ের মূল্যের ৩ এর ২ অংশ টাকা মূলধন হইলে কারখানা চালান হয়। গুড়ের মূল্য মণপ্রতি ৩ টাকা ধরিলে প্রত্যেক পেতেয় ৮ টাকা হিসাবে মূলধনের আবশ্যক হয়। ....এই সময়ে কলিকাতায় Gladstone, Wyllie & Co. চৌগাছায় আসিয়া কারখানা খুলেন। ....প্রথমে স্থানীয় সমস্ত খেজুর রস কিনিয়া লইয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিতেন। ....বহুস্থানে চিনির কল বা কারখানা বন্ধ হইলেও

এখনও সর্বত্র কুড়াইয়া যশোহরে যে চিনি পাওয়া যায়, তাহা সমগ্র বঙ্গের উৎপন্ন চিনির ৪ এর ৩ অংশ অপেক্ষাও বেশী।

মার্চ ১৯১৩ সালে প্রকাশিত HAROLD E. ANNETT লিখিত MEMOIRS OF THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE IN INDIA নামক গ্রন্থের Part II-তে যশোরের খেজুরের গুড়ের ইতিহাস নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে-

"In Jessore, the most important of the sugar producing districts, the industry is an old one. The Collector of Jessore in 1788 enumerated as one of the losses Caused by the cyclone of 1787 the injury to the date trees and the weakening of the sugar produce. Later on, in1792, he wrote that "date sugar is largely manufactured and exported." and in a statistical table prepared in 1791 we find it recorded that 20,000 maunds was the annual produce of the sugar cultivation and that about half of this was exported to Calcutta. At that time, however, there was a considerable production of cane sugar as well."

একই গ্রন্থের ২৯২ নং পৃষ্ঠায় History of English Sugar Factories in Jessore শিরোনামে লেখা হয়েছে- "The factory of Chaugachha was established about the same time (1842) by Gladstone, Wyllie & Co. of Calcutta." যেখানে চৌগাছায় খেজুরের গুড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থের ২৯০ নং পৃষ্ঠায় যশোর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় খেজুর গাছের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালে প্রথম মুদ্রণ হয় 'বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা যশোর' নামক একটি বইয়ের। সেই বইয়ের ৮০ নং পৃষ্ঠায় চৌগাছার ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি 'ফোলই'তে আছে,

"আর বহু বহু ঘটনা ঘটে বলুর মামি বাড়ি,
রস জাল দেয় বলু নিজি হয়েগো খড়ি,
খড়ির মতো জ্বলে বলু, লস হয়ে যায় গুড়
মামি দেখে অবাক হয়রে দেখে দেয় দৌড়।"

একই বইয়ের ১২৯-৩১ পৃষ্ঠায় যশোরের খেজুরের গুড় নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে, "এছাড়া যুগ যুগ ধরে যে ঐতিহ্যের কারণে ইংরেজরা এ ইউনিয়নের তাহেরপুরে খেজুর গুড়ের চিনি শিল্প (কুঠিবাড়ি) স্থাপন করেছিলেন, সেই খেজুর গাছের রস গুড় সম্পর্কে পদ্য আছে---

শীতল অতল তনু অন্নায় মিষ্টি রস
পিঠা পায়েস আয়েস করা
খেজুর গাছের ইতিহাস।

উৎপাদিত খেজুর গুড় নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যত্র রপ্তানি করে। শীতকালীন কৃষিজ আয়ের প্রায় ৪০% আসে খেজুর গুড় থেকে। গুড় বা চিনি দিয়ে প্রস্তুত করা হয় বাতাসা, কদমা প্রভৃতি মিষ্টি খাবার। আরও আছে, "খেজুরের রসের গুড়-পাটালি শীতের আকর্ষণীয় খাদ্য। রস পিঠা, পায়েশ, চিড়ে, মুড়ি, নারকেল সহযোগে বিচিত্র খাদ্য পরিবেশিত হয়ে থাকে।" আগেই বলা হয়েছে, যশোর অঞ্চল খেজুর গাছের জন্য বিখ্যাত। প্রত্যেক বাড়িতে খেজুর গাছ ছাড়াও আছে বাণিজ্যিক খেজুর বাগান। শীত ঋতুতে খেজুর গাছের অগ্রভাগে বিশেষ পদ্ধতিতে খাঁজ কাটা হয়। যারা কাজটি করে তারা পরিচিত শিউলি হিসেবে। খেজুর গাছের খাঁজ কাটা অংশে তারা বাঁশের টুকরো-চটা বিশেষ পদ্ধতিতে পুতে দেন। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে খেজুর রস। সাধারণত সপ্তাহে একদিন কর্তিত অংশে পুনঃকর্তন করেন শিউলি। কর্তনের পরপরই যে রস পাওয়া যায় তা অপেক্ষাকৃত সুস্বাদু। দ্বিতীয়বার কর্তনকে দোকাট বলে। এরপরেও কিছু দিনের জন্য রস পাওয়া যায়, যা 'ওলা রস' বলে খ্যাত। ওলা রস স্বাদের দিক থেকে টক ও গন্ধযুক্ত। রস সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হয় কলসি, ভাঁড়, খোপ প্রভৃতি রসের আধিক্য বিবেচনা করে শিউলি পাত্র নির্বাচন করে। রস সংগ্রহের পর গুড় বা পাটালি তৈরীর জন্য তা লম্বা বা গভীর কড়াইয়ে জাল দেওয়া হয়। এই জালের সময় রসের মধ্যকার জলীয়বাষ্প বের করে দেওয়ার জন্য লম্বাকৃতির চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া করা হয়। আস্তে আস্তে রস ঘন লালচে হয়ে আসে। প্রথমাবস্থায় রসের ফেনা জমে আটালো আকৃতি হয়। এ অংশটি পরিচিত 'চিটামিষ্টি' নামে। শিশুরা কলাপাতায় 'মিঠামিষ্টি' খেতে খুবই পছন্দ করে। গুড় আরো ঘন হলে বিশেষ ছাঁচে ফেলে পাটার আকৃতি জমাট করা হয়; এইগুলোই পাটালি। পাটালি সুস্বাদু করার জন্য এর সাথে নারকেল, তেতুঁল ইত্যাদি মেলানোর চল আছে। এগুলো মিশ্রিত দ্রব্যের নামে পরিচিত হয়। যেমন নারকেলে পাটালি, তেঁতুল পাটালি ইত্যাদি। যশোরের পাটালি ও গুড় দেশে-বিদেশে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে।"

২০১৮ সালে প্রকাশিত জেলা ব্রান্ডিং বইয়ের ৪০-৪৩ নং পৃষ্ঠায় যশোরের খেজুর গুড় নিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, "যশোরের যশ, খেজুরের রস। সুপ্রাচীনকাল থেকে যশোরের খেজুরের রস আর পাটালি গুড়ের কদর রয়েছে উপমহাদেশ জুড়ে। প্রাকৃতিকভাবেই এ অঞ্চলের খেজুরের রস স্বতন্ত্র সুমিষ্ট স্বাদ আর বিভিন্ন ধরনের পাটালি বিশেষত যশোরের সদর উপজেলার খাজুরা এলাকার বামনডাঙা, তেজরোল, রাজাপুর ইত্যাদি গ্রামে তৈরি হয় অনন্য স্বাদের উৎকৃষ্ট মানের পাটালি গুড়।" ৪১ নং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, "পৌষ এলেই সমগ্র যশোরের মাঠ, প্রান্তর, গ্রাম-গঞ্জে খেজুর রসে মৌ মৌ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। গাছ কাটুনি, রসের হাঁড়ি পোড়ানো, রস বয়ে নিয়ে যাওয়ায় ব্যস্ত থাকেন যশোরের গাছিরা"। ৪২ নং পৃষ্ঠায় আছে, "যশোরের ঐতিহ্যের প্রতীক মধুবৃক্ষ থেকে সুমধুর রস আহরণ করে ঘরে ঘরে শুরু হয় গুড় ও পাটালি তৈরির মহোৎসব"। ৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "যশোরের ঘরে ঘরে নির্মিত পাটালি ও নলেন গুড় নিজস্ব স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। আকৃতি, রঙ ও স্বাদের দিক থেকে এগুলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাটালির আবরণ থাকে শক্ত, কিন্তু ভেতরটা গলে যাওয়া মোমের মত। এই গুড়ের সুমিষ্ট স্বাদ সত্যিই অতুলনীয়"। যশোর জেলা চৌগাছা উপজেলার জামালতা গ্রামের কবি মোঃ আবু জাফর বিশ্বাস তার 'খেজুরের রস' কবিতায় লিখেছেন, "যশোরের যশ খেজুরের রস/ঐতিহ্য রেখেছে ধরে/কার্তিক মাসে খেজুর গাছ/তোলা-চাঁছা করে।"

ঝ) উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ

যশোর অঞ্চলে একটু উঁচু স্থানে খেজুরের বীজ ছিটিয়ে রাখলেই গাছ হয়ে যায়। এর জন্য বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয় না। গরু ছাগলেরও আক্রমণ হয় না খেজুর গাছের উপর। চারা গাছের মৃত্যুর হার নেই বললেই চলে। গাছ নিজে নিজে বড় হতে থাকে। ৬-৭ বছর বয়স থেকে খেজুর গাছ রস দেওয়া শুরু করে। তা চলে বহু বছর ধরে।

মূলত শীত মৌসুমে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। খেজুর গাছে যারা রস সংগ্রহের কাজ করে তাদেরকে গাছি বা শিউলি বলা হয়। শীত শুরুতে অর্থাৎ নভেম্বর মাসে গাছিরা খেজুর গাছের উপরের অংশের পাতাগুলোর গোড়া কেটে দেয়। এরপর ‘গাছি দা’ দিয়ে চেঁছে বাকল পরিষ্কার করে। এই পদ্ধতির নাম ‘গাছতোলা’। এরপর খেজুর গাছের পরিষ্কার করা অংশ ১৫–২০ দিন অবসর পেয়ে শুকায়। গাছের নরম পরিষ্কার অংশটিকে রস বের করার উপযুক্ত করতে পুনরায় চাঁছ দেওয়া হয়। কয়েক ধাপে চাঁছ দেওয়ার পর সাদা হয়ে দেখতে অনেকটা রুপার মতো চকচক করে। গাছে চোখ তৈরি করা হয়। তা দেখতে মানুষের চোখের মতোই। দুই চোখ পরস্পর বিপরীত দিক থেকে ঢালু হয়ে এসে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এই চোখ তৈরির দক্ষতা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালন করে আসছে গাছিরা। গাছি তার সূক্ষ্ম শানানো দা দিয়ে ধীরে ধীরে খেজুর গাছের নরম অংশে চোখ তৈরি করেন। চোখ তৈরির সময় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করার জন্য অনেক গাছি বিশেষভাবে শিস বাজিয়ে থাকেন। দুই চোখের মাঝখানে পোতা হয় ‘নলী’। তা বাঁশের কঞ্চি কেটে তৈরি করা হয়, দেখতে লম্বালম্বিভাবে দ্বিখন্ডিত পাইপের মতো। ভাঁড় স্থাপনের জন্য নলীর দুই পাশে ‘গোজা’ পোতা হয়। এটি এক প্রকার বাঁশের তৈরি পেরেক। ভাঁড় সরাসরি স্থাপনের পূর্বে শুকনো খড় পুড়িয়ে তার ভিতর ধোঁয়া ও আগুনের স্যাক দেওয়া হয়। যার উদ্দেশ্য জীবাণু মুক্ত করা। চোখ তৈরি হয়ে গেলে পোড়ানো ভাঁড় কানাচের (ভাড়ের গলায় বাঁধা দড়ি) সাহায্যে গাছে পোতা গোজার সাথে টানানো হয় যেখানে নলির মাথা ঠিক ভাঁড়ের মাঝখানে থাকে। গাছিরা সাধারণত পড়ন্ত বিকালে গাছ কাটার (চোখ তৈরি করে) কাজ করে। সারা রাত নলি বেয়ে ভাঁড়ে রস জমা হয়। খুব ভোরে গাছিরা সেই রস সংগ্রহ করে। এরপর ‘বাঁক’ (বাশের লম্বা টুকরো) এর দুই মাথায় রস ভর্তি ৮–১০ ভাঁড় ঝুলিয়ে বাড়িতে বাড়িতে যায় গাছিরা।

বাড়িতে এনে পরিষ্কার ছাকনি দিয়ে ছাকা হয়। এরপর উনুনে একটি পাত্রে উচ্চ তাপে রস সিদ্ধ করা হয়। ৪-৫ ঘণ্টা জ্বাল দেওয়ার পর তরল রস ঘন হয়ে আসে। এই সময় খুবই সতর্ক থাকতে হয়। নতুবা জ্বালে কম-বেশি হলে গুড় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গাছি যখন বুঝতে পারেন গুড় তৈরি হয়ে গেছে তখন চুলা বন্ধ করে গুড়ের পাত্রটি নামিয়ে অন্য স্থানে রাখেন। এটা সাধারণ গুড় তেরি হয়েছে। আসল গুড় তৈরি করার জন্য পাত্রের একটি অংশ খেজুরের শক্ত ডোগা দিয়ে ঘষতে থাকে গাছি। এটাকে বলা হয় ‘বিচ মারা’। কিছুক্ষণ ঘষার পর বিচ মারার কাজ সম্পন্ন হয়। আর তৈরি হয় সুস্বাদু দানাদার জিড়ের রসের নলেন গুড়। এর ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে চার পাশে।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

মাটি ও জলবায়ুর কারণে যশোর অঞ্চলে একটু উঁচু স্থানে খেজুরের বীজ ছিটিয়ে রাখলেই গাছ হয়ে যায়। এখানকার খেজুর গাছে গরু ছাগলের উৎপাত নেই। গাছের বয়স ৬/৭ হলেই রস পাওয়া যায়। যশোর অঞ্চলে যত সহজে জমিতে খেজুর গাছের চাষ হয় তা দেশের অন্য কোথাও হয় না। বিশেষ পরিচর্যা ছাড়াই বছরের পর বছর ধরে সুস্বাদু রস পাওয়া যায় এবং তা থেকে উন্নতমানের গুড় উৎপাদন করা যায়। এখানকার গাছিরা বংশপরম্পরায় দক্ষতা অর্জন করে। যশোরের গুড় মুখে দিলেই ভোক্তারা স্বাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

ট) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসন, যশোর।

ঠ) ব্যবহারকাল ঃ

৪০০ বছর আগে হতে অব্যাহতভাবে যশোরে উন্নতমানের খেজুরের রস ও গুড় পাওয়া যায়।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি ঃ

ছবি : ৩ বছর বয়সী খেজুর গাছ

ছবি : ৭-৮ বছর বয়সী খেজুর গাছ

ছবি : রস সংগ্রহের জন্য ৭-৮ বছর বয়সী গাছ প্রস্তুত করা হয়েছে।

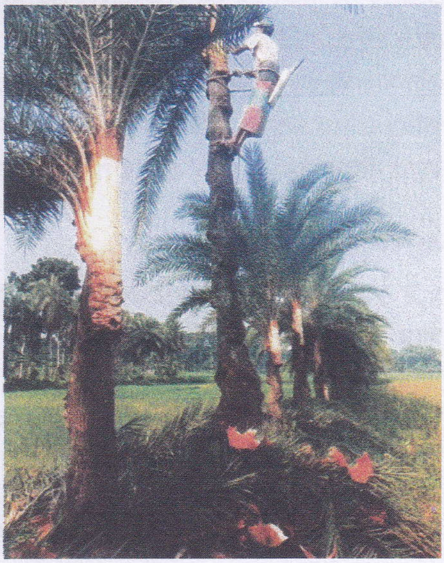

ছবি : রস সংগ্রহের জন্য গাছি দা দিয়ে চেঁছে বাকল পরিষ্কার করছে।

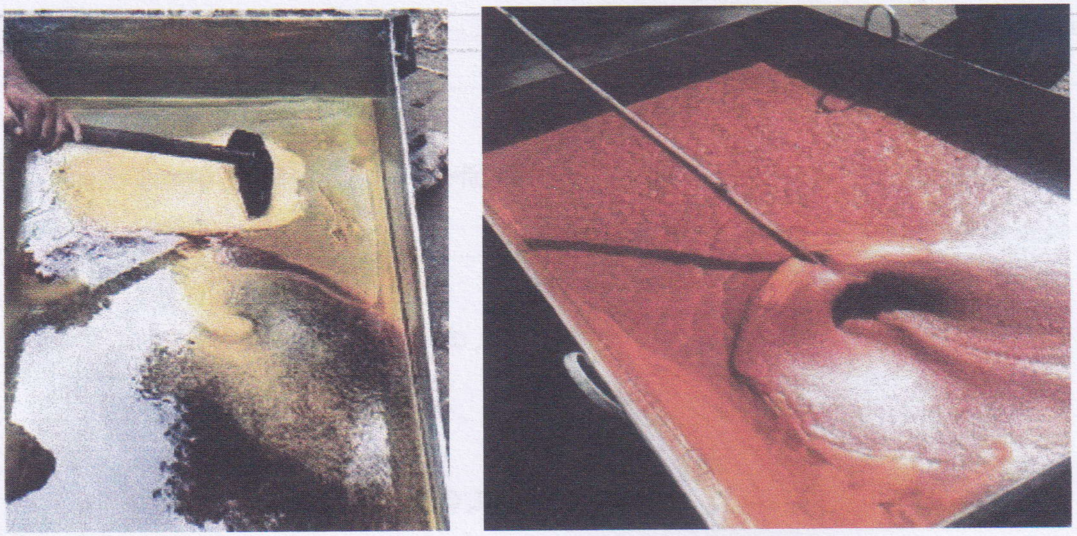

ছবি : রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করা হচ্ছে।

ছবি : বিক্রয় উপযোগী নলেন গুড় এবং পাটালি গুড়।

ড) যশোরের খেজুরের গুড় উৎপাদনকারিদের তালিকা ঃ
নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা

মোঃ বজলুর রহমান সৈয়দপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৮৩৩১৯৫৭৪	মোঃ কুদ্দুছ শেখ সৈয়দপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৬২৭৯০৬৭২	শেখ আব্দুস ছোবহান সৈয়দপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৯০৯৩৩০৪০
মোঃ দাউদ হোসেন কোটালীপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৫১৫৬৯৫৪০	মোঃ মকবুল হোসেন কোটালীপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৯৫৬০৫৪৩৫	মইরুদ্দিন দূর্বাবরকাটি, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৫২৫৭১৭১৫
মোঃ কাজল আলী মোহাম্মদপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৩০৪২৬৭৫২৭	মোঃ জিয়াউর রহমান মোহাম্মদপুর, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৩০৪৯০৭৭৬৫	মোঃ আব্দুর রহিম জামিরা, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭২৭৫৮৭৮৩১
মোঃ লুৎফর রহমান জামিরা, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৬৪৪৯৮৩৮৭	মোঃ আবু কাশেম পাশাপোলা, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৯৪৩১৮২৭৭৫	মোঃ রেজাউল তরফদার পাশাপোলা, ফুলসারা, চৌগাছা ০১৭৯৫০৯৩২৫৪
মোঃ আনারুল মন্ডল দশপাখিরা, ২নং পাশাপোল, চৌগাছা ০১৭০৭৭৯৪১২৬	মোঃ লাল্টু মিয়া দশপাখিরা, ২নং পাশাপোল, চৌগাছা ০১৯১৪০৮৭০৫৭	মোঃ সিদ্দীক আলী জগন্নাথপুর,৩নং সিংহঝুলি, চৌগাছা ০১৭২৬৬১৩১০০
মোঃ শাহিন আলী জগন্নাথপুর, ৩নং সিংহঝুলি, চৌগাছা ০১৭১৫৮২৭৫৯৬	মোঃ খায়রুল ইসলাম গরীবপুর, ৩নং সিংহঝুলি, চৌগাছা ০১৭৪৯৩৬৬৭০৪	মোঃ আলমগীর হোসেন গরীবপুর, ৩নং সিংহঝুলি, চৌগাছা ০১৩০৪১০০৯৬০
সিদ্দিক হোসেন হুদাফতেপুর, ৩নং সিংহঝুলি, চৌগাছা ০১৭১৬৪৮৬১৯৫	শাহাদ আলী হুদাফতেপুর, ৩নং সিংহঝুলি, চৌগাছা ০১৭৭৪৭২২৮৫১	মোঃ আব্দুল সেলিম বড় কাবিলপুর, ৪নং ধুলিয়ানী, চৌগাছা ০১৭৩৬৯৫৮১৮৫
মোঃ নজিবার রহমান বড় কাবিলপুর, ৪নং ধুলিয়ানী, চৌগাছা ০১৭৩৮৬৩১৭০৮	মোঃ জালাল উদ্দিন বড় কাবিলপুর, ৪নং ধুলিয়ানী, চৌগাছা ০১৭৫৬৯৮৭৭০৯	মোঃ আব্দুল আলীম ছোট কাবিলপুর, ৪নং ধুলিয়ানী, চৌগাছা ০১৭২৬৭৭২৯২৯

মোঃ বজলুর রহমান ছোট কাবিলপুর, ৪নং ধুলিয়ানী, চৌগাছা ০১৭০৪৭৯৩৮৪৫	মোঃ ওদুদ মন্ডল জগদীশপুর, চৌগাছা ০১৭৭৫০৪৪৯৫৮	মোঃ বছির উদ্দীন জগদীশপুর, চৌগাছা ০১৭৬২৩৪৯৮০৯
মোঃ জহুরুল ইসলাম আলম স্বর্পরাজুর, জগদীশপুর, চৌগাছা ০১৭৮৫৮৪৬৬৪৮	মোঃ তাইজুল হোসেন স্বর্পরাজুর, জগদীশপুর, চৌগাছা ০১৭৭৬৩৪২০৪	জমির হোসেন মির্জাপুর, জগদীশপুর, চৌগাছা ০১৭৪৬৭৬৯৬২৯
মোঃ ছামছুল হক মির্জাপুর, জগদীশপুর, চৌগাছা ০১৭২৭৪০৭৬৪৬	মোঃ হারু মোল্যা নিয়ামতপুর, ৭ নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৭৪৫৩৯৮৭৮৪	মোঃ জহুরুল ইসলাম নিয়ামতপুর, ৭ নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৭৫৪৬৪৬৯৬৬
মোঃ ওয়াজেদ আলী নিয়ামতপুর, ৭নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৭৭১৪৬১৩৯৭	মোঃ শাহাজুল হক মুক্তাদাহ, ৭ নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৭৬১৬৮৬০৪	মোঃ নুর ইসলাম মুক্তাদাহ, ৭নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৭৮০৭৮৬১৫২
মোঃ আব্দুল আলিম রোস্তমপুর, ৭নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৭৫৩১৫৫৮৭৩	মোঃ মুনতাজ আলী রোস্তমপুর, ৭ নং পাতাবিলা, চৌগাছা ০১৬২৫৬০৩৩০৩	মোঃ শফিউদ্দীন কোমারপুর, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৮৫৩৩৫৯৬৮৫
মোঃ আনোয়ার হোসেন কোমারপুর, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৯১১১৫৯১৩৩	মোঃ ইসরাইল হোসেন চাকলা, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৯৬৬০১২৯১৯	মোঃ জহর আলী কোমারপুর, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৮৯১৭৫০৯৪৯
আজগার মন্ডল ফকিরাবাদ, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৭৭২৯৪৫০৮৮	মোঃ আশাদুল মন্ডল চন্দ্রপাড়া, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৭৩২৬০০৮৩৪	মোঃ আমিরুল ইসলাম ফকিরাবাদ, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৯২৬৭০৬৮০৩
মোঃ আবু জাফর চন্দ্রপাড়া, ৮নং হাকিমপুর, চৌগাছা ০১৭০৯৮০৫৪১৮	মোঃ খান জাহান আলী চাঁদপাড়া, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৭৩৯৭৪৪৩৩৪	মোঃ গোলাম রসুল চাঁদপাড়া, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৭৮৫৮৪৫৬৯৫
মোঃ রতন খান চাঁদপাড়া, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৭৭৫১৬৮১৯৫	মোঃ ভদু মন্ডল বড়খানপুর, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৭৪১৫১৬৯৭৩	মোঃ ওমর আলী বড়খানপুর, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৬১৯৬৮৫৪২
মোঃ মমিনুর রহমান পেটভরা, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৩০৬৩৩৭৮৩৫	সুজিত কুমার পেটভরা, ১০নং নারায়নপুর, চৌগাছা ০১৭৩১৬৭৩৫২	মোঃ শরিফুল ইসলাম নগরবর্নি, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৩২৩৩৪২৬০২
মোঃ হাতেম আলী নগরবর্নি, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭৭৩৫০০৪১০	মোঃ আঃ হামিদ নগরবর্নি, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭৫৩৪৮৮৫০৪	মোঃ আব্দুল খালেক বর্নি, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭২৬১১৫৬৩২
মোঃ আব্দুল রশিদ মুকুল বর্নি, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭৫১৫৫৩৮০৫	মোঃ সাইদুল ইসলাম বর্নি, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭৮২৩৪৩৯৩৮	মোঃ হযরত আলী সুখপুকুরিয়া, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৯০২৫১৩৪২১
মোঃ হাসেম আলী সুখপুকুরিয়া, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭৭৪২৬১১৭৩	পরিমল বাগ সুখপুকুরিয়া, ১১ নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৭৫২৭০১৯৩৩	মোঃ ইনাত আলী তিলকপুর, ১১নং সুখপুকুরিয়া, চৌগাছা ০১৩২০৭৪৭৮৪৫

রেফারেন্স ঃ

১। যশোহর খুলনার ইতিহাস/দ্বিতীয় খন্ড/শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র/প্রথম সংস্করণ : ১৯২২
পৃষ্ঠা: ৪৮৯-৯৪

২। বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা-যশোর/শামসুজ্জামান খান/প্রথম প্রকাশ ২০১৪
পৃষ্ঠা: ১২৯-৩১

৩। জেলা ব্রান্ডিং বুক/জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/যশোর/প্রথম মুদ্রণ ২০১৮
পৃষ্ঠা: ৪০-৪৩

৪। খেজুরের রস (কবিতা)/মোঃ আবু জাফর বিশ্বাস
https://banglarkobita.com/poem/view/67575

৫। যশোর খেজুর গুড় বিক্রির ধুম/জনকণ্ঠ/৬ জানুয়ারি, ২০১৮
https://www.dailzjanakatha.com/national/news/319799

৬। যশোরের খেজুরের গুড় ও পিঠা/বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন/যশোর জেলা
https://www.jessore.gov.bd/bn/site/top banner/SYTc-যশোরের-খেজুরের-গুড়-ও-পিঠা

৭। বাংলাদেশের ঐতিহ্য যশোরের খেজুরের গুড়/যশোরের আলো/২ জানুয়ারি, ২০২০
https://www.jashoreralo.com/বাংলাদেশের-ঐতিহ্য-যশোরের-খেজুরের-গুড়/৩৩৬৬২

৮। যশোরের খেজুর গুড়/ইনকিলাব/৩ জুন, ২০২৩
https://dailzinqilab.com/special/article/578565

৯। যশোরে খেজুর গুড় বিক্রি করে ১৩ হাজার গাছি লাভবান/বাসস/৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২২
https://www.bssnews.net/bangla/national/29038

১০। খেজুরের গুড়ের যত উপকারিতা/সমকাল/৭ জুন, ২০১৮
https://www.samkal.com/lifestzle/article/1801378/খেজুরের-গুড়ের-যত-উপকারিতা

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-খ-১১৯৫/২৩-২৪/শিল্প-১৫-০২-২০২৪-২০০ বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.

2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.

3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   150, Government New Market, Dhaka.

4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.

5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.

6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.

7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.

8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.

9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.

10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.

11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman, Deputy Director (Deputy Secretary)
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.